জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১০, সংখ্যা-২, জুলাই–ডিসেম্বর ২০২০

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামের বিধান : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

মো. ইব্রাহীম খলিল*

Abstract

Violence against women is a serious social problem in the world. Somehow, this problem exists from the beginning of human civilization. Various measures were taken to overcome this problem but failed to succeed. Day after day, this issue has become more complicated common place. Islam has a unique law to prevent violence against women. Through this law, Hazrat Muhammad (sm) gave women freedom from all oppressions. During the rule of the Khulafa-e-Rashideen woman would hold the highest positions. After the departure of the rule of Islam, women have been abused and tortured again. The torture exists for ages in different countries. Bangladesh is no exception. Women are abused here. There are many laws against the abuse of women. There are numerous agencies and organizations for the protection of women. But violence against women goes unabeted. Impementing laws of Islam to prevent violence against women is considered to be the most useful and effective one. Women in Bangladesh can mainly through Islamic law be free from this curse.

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে নারী নির্যাতন অন্যতম। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এ দেশে পরিবারে ও সমাজে নারী নানা ধরনের নিপীড়নের শিকার। দৈহিক দিক থেকে পুরুষের তুলনায় দুর্বল এবং আর্থিকভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় পুরুষ নারীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে নানাভাবে নিপীড়ন চালায়। নারীর প্রতি অবজ্ঞা ও ভুল ধারণার কারণে নির্যাতনের ঘটনা নিয়মিত ঘটে। বাংলাদেশের সমাজে নিয়মিতভাবে নারীর মানবাধিকার খর্ব করা হয়, নারী নানা বৈষম্যের শিকার হয়, নারীর আকাঙ্ক্ষা ও বিকাশের সম্ভাবনাকে দমন করা এবং আর্থ-সামাজিক কারণে নারী অসহায়ত্বের শিকার হয়। এ দেশে বিষয়গুলো নারীদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। এর সাথে সাথে নারী জীবনের অনিবার্য অনুসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে অমানবিক, লোমহর্ষক, ভয়ঙ্কর ও কুৎসিত নির্যাতন। বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের এ হার প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসূত্রে নারী নির্যাতনের যে সকল সংবাদ জানা যায় তা আতঙ্কিত হওয়ার মতো এবং পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সরকার নারী নির্যাতনে নানা বিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রচলিত আইনে নারী নির্যাতনমূলক অপরাধ দমন সম্ভব না হওয়ায় স্বতন্ত্র নারী নির্যাতন আইন প্রণয়ন করেছে। ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮৪ সালের নারী নির্যাতন নিবর্তকমূলক আইন (শাস্তিযোগ্য) ও বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন (সংশোধিত অর্ডিন্যান্স), ১৯৮৫ সালের সংশোধিত মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১ ও পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৯২ সালের সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ, ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এবং ২০০৯ সালের যৌন হয়রানি রোধক হাইকোর্টের রায় বাংলাদেশের নারী নির্যাতন বন্ধ করতে পারেনি। এ সকল বিশেষ আইনের সাথে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে প্রণীত নারী অধিকার রক্ষা ও নির্যাতন বিরোধী আন্তর্জাতিক আইন। শিক্ষায় নারীর জন্য উপবৃত্তি ও অবৈতনিক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। চাকরিতে নারীকে নানাভাবে অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশে সরকার ও বিরোধী দলের নেতৃত্ব এবং সংসদের অভিভাবকত্ব করছে নারী। স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা ও পররাষ্ট্রের মত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মন্ত্রণালয়ও সামলিয়েছে নারী। নারী ক্ষমতায়নের এমন অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে নারী নির্যাতন বন্ধ হয়নি; বরং নারীরা নানাভাবে নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। এমন প্রেক্ষাপটে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে নারী নির্যাতন নির্মূলের জন্য দেশের বর্তমান সমাজকাঠামো বহাল রেখে ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও বিধান প্রয়োগ নতুনভাবে মূল্যায়নের দাবি রাখে। কারণ, সাধারণভাবে বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু। যথার্থভাবে তাদেরকে ধর্মীয় বিধিসমূহ অবহিত করা এবং তা পালনে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হলে নারী নির্যাতনের মত একটি বিভৎস নিষিদ্ধ কাজ থেকে তারা বিরত থাকবে এবং নির্যাতন প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করবে।

২. গবেষণার পটভূমি

২.১ গবেষণা পদ্ধতি : গবেষণাটি মূলত মিশ্র পদ্ধতিতে[১] পরিচালিত হয়েছে। অর্থাৎ গবেষণাটিতে গুণগত (Qualitative) ও পরিমানগত (Quantitative) উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণা সংশ্লিষ্ট উপাত্ত বিশেষত নারী নির্যাতন সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রত্যক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। দেশে বিদ্যমান নারী নির্যাতন প্রতিরোধক আইনের বিপরীতে ইসলামি আইনের প্রয়োগগত ও কার্যকারিতাগত দিকগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়ার জন্য তুলনামূলক অধ্যয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে ফলাফল উপস্থাপনের জন্য বর্ণনা (Descriptive Method) ও বিশ্লেষণমূলক (Analytical Method) অনুসরণ করা হয়েছে।

২.২ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা : নির্যাতনের শিকার নারীদের জন্য ধর্মীয় বিধানের ভিত্তিতে অধিকতর মানবিক ও কার্যকর প্রতিবিধান অন্বেষণ করা। বিদ্যমান আইনের ব্যর্থতা ও অকার্যকারিতার বিপরীতে ইসলামি আইনের সফলতা ও কার্যকারিতার দিকগুলো তুলে ধরা। বাংলাদেশের ধর্মভীরু মানুষের আবেগ কাজে লাগিয়ে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নারী নির্যাতন বিরোধী মানসিকতা ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবন করা। বাংলাদেশে চলমান নারী নির্যাতন পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও অমানবিকতার কারণে ধর্মীয় দৃষ্টিতে এর একটি বিকল্প উপায় অন্বেষণ আবশ্যক।

২.৩ গুরুত্ব ও ফলাফল : বাংলাদেশের মতো ৯০.৩৯% ভাগ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ[২] একটি দেশে এ ধরনের গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত ধর্মের যথার্থ জ্ঞানের অভাবে ধর্মের নামে পরিচালিত নারী নির্যাতন নির্মূলে এ জাতীয় গবেষণা অত্যাবশ্যক। গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলাম কঠোর শাস্তিমূলক বিধানের পাশাপাশি সংশোধনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি প্রবর্তন করেছে। এ সকল বিধান ও কর্মসূচি যথাযথ ধর্মীয় আবেগসহ নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হলে বাংলাদেশ নারী নির্যাতনের অভিশাপ মুক্ত হবে।

২.৪ সীমাবদ্ধতা ও পরবর্তী অধ্যয়ন : গবেষণাটি আরও প্রায়োগিক ও বাস্তবভিত্তিক করার জন্য নারী নির্যাতনের সাথে জড়িত সকল পক্ষ এবং প্রতিরোধের চেষ্টায় নিয়োজিত সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য গ্রহণ প্রয়োজন ছিল। বিশেষত সাক্ষাৎকার ও সমীক্ষা পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায়ের তথ্য গ্রহণ করা যেত। কিন্তু বিষয়ের পরিসরগত বিশালতা এবং আর্থিক কোনো অনুদান না থাকায় এগুলো সম্পন্ন করা যায়নি। জাতীয় পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের উপায় ও তা কার্যকর করার পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা প্রবন্ধটির পরিসর অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছিল। এটিকে সূত্র বা সূচনা বিবেচনা করে বৃহত্তর পরিসরে জাতীয় পর্যায়ে এ ধরনের প্রায়োগিক দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩. নারী নির্যাতন

নারী হলো স্ত্রীলোক, রমণী, মহিলা। নির্যাতন হলো পীড়ন, উৎপীড়ন, নিগ্রহ, অত্যাচার, প্রহার, প্রতিহিংসা।[৩] কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর যখন অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠী হুমকি বা বল প্রয়োগ করে তাকে নির্যাতন বলে।[৪] নারীকে হুমকি বা বল প্রয়োগ করা হলো নারী নির্যাতন। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ molestation or persecution of a woman[৫] Women's Oppression[৬] Crutelty to Women[৭] ইত্যাদি শব্দ থাকলেও Violence against Women হলো সকলের নিকট গ্রহণীয় পরিভাষা।[৮]

সি. বানচের মতে, নারী নির্যাতন, তা যে ধরনেরই হোক না কেন, কোনো বিক্ষিপ্ত বিষয় নয় এবং যৌনতা সম্পর্কিতও নয়। এ নির্যাতনের একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক উদ্দেশ্য আছে এবং তা হচ্ছে নারীর জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও তাদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করে রাখা।[৯]

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে জাতিসংঘ ১৯৭৫ সাল থেকে বিশ্ব জুড়ে কাজ করে চলেছে। প্রতিবছর এ বিষয়ের উপর আলোচনা, বিতর্ক ও সুপারিশ চলছে। এর ২০ বছর পর ১৯৯৫ সালে পৃথিবীর সব দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধিরা নারী নির্যাতন রোধে একটি অবশ্য পালনীয় বিধি তৈরি করেছে। এটি হলো বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন। এই বিধির বিশ্লেষণ ও ঘোষণাটি নিম্নরূপ, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা হলো নারী ও পুরুষের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে বিরাজমান অসম ক্ষমতা সম্পর্কের একটি বহিঃপ্রকাশ, যা নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও নারীর বিরুদ্ধে পুরুষের বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। নারীর পরিপূর্ণ অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে।[১০]

১৯৯৫ সালে বেজিং-এ অনুষ্ঠিত নারী বিষয়ক চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলনের Platform for Action (PFA)-এ নারী নির্যাতনকে নির্দিষ্ট করে যা বলা হয় তা হলো, "....any action of gender violence that results in or is likely to result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion of arbitrary deprivation of liberty whether occurring in public or private life.[১১]

২০০২ সালে ঢাকায় আয়োজিত 'Sub-Regional Expert Group Meeting on Eliminating Violence against Women' শীর্ষক সম্মেলনে বলা হয়, নারী নির্যাতন শুধু কোনো ব্যক্তির উপর আক্রমণাত্মক বিশেষ কিছু নয় বরং নারীর বিরুদ্ধে মানসিক অথবা শারীরিক অথবা স্বাধীনভাবে চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ।[১২]

৪. বাংলাদেশে নারী নির্যাতিত হওয়ার কারণ

নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলাদেশে যে সমাজ কাঠামো ও মানসিকতা তৈরি হয়েছে, তা অনেকাংশে নারী নির্যাতনের অনুকূল। সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নারী অধঃস্তনতাকে নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ হিসেবে সনাক্ত করা হয়।[১৩] ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ, মানসিক অসুস্থতা ও বিকৃতি, ব্যক্তিত্বের ত্রুটিপূর্ণ ধরন-কাঠামো এবং দুর্বল নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ নারী নির্যাতন সমস্যা সৃষ্টি ও বিস্তারে ক্রিয়াশীল হয়।[১৪] বেকারত্ব বা কর্মসংস্থানহীনতা, দারিদ্র্য, কম মজুরী ও বিত্তহীনতার সাথে অনেক গবেষক নারী নির্যাতনের সম্পর্ক লক্ষ করেছেন।[১৫] সমাজে শিক্ষা ও নৈতিকতার অবনতি ঘটলে মানুষের মধ্যে নানা রকম বিচ্যুত আচরণ জন্ম নেয় ও বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে মানবীয় বিচারবোধ গড়ে ওঠে না বলে বর্বরতা-পাশবিকতায় মানুষ নিজেকে জড়িত করতে কুণ্ঠাবোধ করে না।[১৬] উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রেক্ষাপটের অভাবে নারীবাদী আন্দোলন বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের ব্যক্তিত্বের সংঘাতে পরিণত হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় অনেক পুরুষ নারীর প্রতি মারমুখী হয়ে ওঠে ও নির্যাতনমূলক আচরণ করে বসে।[১৭] সাম্প্রতিককালে নারী নির্যাতন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে যৌতুক প্রথাকে সনাক্ত করা যায়। যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে

মানসিক ও দৈহিকভাবে নির্যাতন চালানোর ফলে নারীদের মধ্যে আত্মহত্যা এবং হত্যার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১৮]

ইসলাম ধর্মে নারীকে বিপুল মর্যাদা ও বিশেষ অধিকার দেয়া হয়েছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য অনিন্দ্য সুন্দর এবং বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলামের এ সকল ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে সচেতন না। যারা এ বিধানগুলো সম্পর্কে জানে তারাও সঠিকভাবে সেগুলো অনুশীলন করে না। এ কারণে ধর্মের নামে এখানে নারীকে অপমানকর নির্যাতনের শিকার হতে হয়, যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।[১৯]

৫. বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ধরন ও প্রকৃতি

বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান প্রান্তিক। এখানে তারা মানুষ হিসেবে পুরুষ কর্তৃক, গৃহবধূ হিসেবে স্বামী কর্তৃক এবং বেতনভুক্ত হিসেবে নিয়োগকর্তা পুরুষ কর্তৃক শোষিত।[২০] বাংলাদেশে আঘাত করা বা অপব্যবহার করা, যৌতুকের জন্য দৈহিক ও মানসিক চাপ দেয়া, মানসিক নিপীড়ন করা, অপহরণ করা, বউ পেটানো, যৌন নিপীড়ন করা, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ করা, ধর্ষণ করা, এসিড নিক্ষেপ করা, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ, বিদেশে পাচার করা, অন্যায়ভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ করা এবং ধর্ষণ করতে গিয়ে জখম বা মৃত্যু ঘটানো ইত্যাদি অপরাধের মাধ্যমে নারী নির্যাতিত হয়ে থাকে।[২১] বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ কারণেই *Status of Women* প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "Violence against women is alarmingly on the increase. The Bangladesh Bureau of Statistics, in a special report in 1993 revealed that death due to unnatural causes (suicides, murder, burn, snake bite, accident and drowning) in almost three times higher for women that pregnancy related causes."[২২]

বাংলাদেশে নারী নানাভাবে নির্যাতিত হয়ে থাকে। যেমন, চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে নারীকে পাচার করা হয়।[২৩] অপ্রাপ্ত বয়সে যৌনকর্মে বাধ্য করা হয়।[২৪] বাংলাদেশে ১৪টি স্থায়ী যৌনপল্লীতে প্রায় ১৫ হাজার যৌনকর্মী রয়েছে। তাদের ৮৩.৪ শতাংশের বয়স ১৮ বছরের কম।[২৫] স্বামীর হাতে নারী নির্যাতিত হয় এবং এ কারণে আত্মহত্যাও করেন।[২৬] কিশোরী মাতৃত্ব ও বাল্যবিবাহকে নারী নির্যাতন বলা হয় আর বাংলাদেশে এর হার যথাক্রমে ৩৩ শতাংশ[২৭] ও ৬৬ শতাংশ।[২৮] যৌতুকের দাবি ও প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, ইভটিজিং, পারিবারিক সহিংসতা, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি মাধ্যমে নারী নির্যাতিত হয় আবার সামাজিক কারণে নির্যাতিত নারীই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়।[২৯]

নারীর অমর্যাদা ও নির্যাতনের ধারায় তাকে নানা প্রলোভনে ব্যভিচারে নিয়োগ করা হচ্ছে, সাথে সাথে তা গোপন ভিডিওতে ধারণ করে বাজারজাত করা হচ্ছে।[৩০] কন্যা সন্তান জন্মের অপরাধে এই একুশ শতকেও নারীকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়।[৩১] সবচেয়ে যাতনার বিষয় হলো, নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার ৯৫ শতাংশ নিম্ন আদালতে খারিজ হয়ে যায়। এর কারণ হিসেবে প্রাথমিক তথ্যবিবরণী দুর্বল, তদন্তে অবহেলা এবং সাজানো মামলাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে আইনজীবিরা। ..... ঢাকার সিএমএম আদালতে ২০০৯ সালে নারী নির্যাতনের ১৩১১টি মামলার মধ্যে ২২৮টি ধর্ষণের আর বাকি ১২২৯টি মামলা যৌতুক, প্রতারণা ও আত্মহত্যায় প্ররোচিত করাসহ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন সংক্রান্ত। ঢাকার বাইরের চিত্রও একই রকম। রাজশাহীতে ২০০৯ সালে মোট ৫২০টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে সাজা হয়েছে মাত্র ২১টিতে। অর্থাৎ এখানেও ৯৬ শতাংশ মামলায় বেকসুর খালাস পেয়েছেন অভিযুক্ত ব্যক্তিরা।[৩২]

গ্রাম্য সালিসের নামে বাংলাদেশে নারীর প্রতি অবিচার করা হয় হর-হামেশা।[৩৩] দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষিকাগণ পর্যন্ত তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার হাতে নিগৃহীত হয়। সম্প্রতি শিক্ষিকাদের সঙ্গে এক

কর্মকর্তার অশালীন আচরণ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে।[৩৪] বাসে নারী যাত্রীরা প্রতিদিন হয়রানি শিকার হচ্ছে।[৩৫] আগুনে পুড়িয়ে হত্যার মত বীভৎস ঘটনাও নারীর ক্ষেত্রে ঘটছে।[৩৬]

নারীকে সামাজিকভাবে সুরক্ষিত রাখার জন্য হাইকোর্ট যৌন হয়রানি রোধে যে রায় প্রদান করেছে, বিশেষভাবে লংঘন করা হচ্ছে সে রায়। কোন প্রতিষ্ঠানই এ রায় মেনে নেয়ার আগ্রহ দেখায়নি।[৩৭]

বাংলাদেশে পথে-ঘাটে নারীকে নানাভাবে উত্যক্ত করা হয়। এর প্রতিক্রিয়া এত ভয়াবহ যে, উত্যক্তকৃত নারীকে প্রায়ই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়। বখাটেদের উৎপাতে নিজের জীবন বাঁচাতে পানিতে পড়ে মারা গেছে তৃষা। নারায়ণগঞ্জের চারুকলার ছাত্রী সিমি এবং খুলনার রুমি উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে আত্মহত্যা করেছে। বখাটেদের উৎপাতে স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের একটি অংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়তে বাধ্য হয়। অনেক অসহায় অভিভাবক মেয়েদের বাল্যবিবাহের মাধ্যমে উৎপাত থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজে নেয়।[৩৮]

বাংলাদেশে গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে ব্যভিচারের অভিযোগে নারীকে নিগৃহীত করা হয়।[৩৯] স্বামীর নির্যাতনে ক্রমান্বয়ে মৃত্যুবরণ করছে অনেক নারী।[৪০] ধর্ষক পশুদের হাতে অমানবিকভাবে নিগৃহীত হয় নারীরা। এ ক্ষেত্রে মানবিকতা, শালীনতা, সভ্যতার চরম সীমা অতিক্রম করে এই সব পশুরা।[৪১]

নারীদের শারীরিকভাবে নির্যাতন, প্রহার বা গায়ে হাত তোলা আমাদের দেশের গ্রাম-গঞ্জে, বস্তি ও নিম্নবিত্ত পরিবারে সাধারণত হয়ে থাকে এবং এর প্রধান শিকার হচ্ছেন স্ত্রীরা। "It is one of the under reported type because in this country patriarchal norms about unequal gender relations in the family prevail. A husband's right to absence his wife is recognized by family and society."[৪২]

বাংলাদেশে নিজ ঘরেও নারী নির্যাতিত হয়। ঘরের নির্যাতনের একটি দিক হলো, এর সংঘটনকারী হচ্ছে পরিবারের ঘনিষ্ঠ পুরুষ ব্যক্তি। পরিবার নামক তথাকথিত নিরাপত্তার আশ্রয়ে এই ধরনের নির্যাতন নারীদের প্রতি সংঘটিত হয় বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা অজানা থেকে যায়। জাতিসংঘ এই নির্যাতন সম্পর্কে বলেছে, "Violence in the family manifests itself in physical, instrumental, often repetitive, which is inter related with the exercise of mental torture, neglect of basic needs and sexual molestation."[৪৩]

২০১৫ সালে বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্মস্থলে যৌন নির্যাতন ও বখাটে দ্বারা উত্ত্যক্তকরণের ঘটনা বেড়েছে। এ বছর যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন মোট ২২৪জন নারী। এর মধ্যে আত্মহত্যা করেছেন ১০জন। যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করে খুন হয়েছেন ৬জন, বখাটেদের প্রতিবাদ করায় লাঞ্ছিত হয়েছেন ২০৫জন নারী এবং স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়েছে চারজন নারীর। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছিলেন মোট ১৪৬জন নারী। এ বছরের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ছিল পহেলা বৈশাখের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসসি এলাকায় কতিপয় বখাটে কর্তৃক কয়েকজন তরুণীর যৌন হয়রানির শিকার হওয়া। যেখানে পুলিশ উপস্থিত থেকেও নীরব দর্শনের ভূমিকা পালন করেছিল। বর্ষবরণে নারী লাঞ্ছনার বিচার চাইতে এসে উল্টো লাঞ্ছিত হয়েছেন ছাত্রীরা। পুলিশের লাথি, ঘুষি খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায় কয়েকজন ছাত্রীকে। এ ছাড়া ১৮ আগস্ট সিরাজগঞ্জের তারাশে মেয়েকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদে বখাটেরা মেয়ের মাকে হত্যা করে। অপরদিকে ২৬ আগস্ট মাদারীপুরে প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বখাটে দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় এক স্কুলছাত্রী আত্মহত্যা করে।[৪৪]

২০১৫ সালে ৮৪৬ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণ–পরবর্তী সময়ে ৬০ জনকে হত্যা করা হয় এবং ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা করেন দুজন। যেখানে ২০১৪ সালে ৭০৭ জন

নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়। এর মধ্যে ধর্ষণ–পরবর্তী সময়ে ৬৮ জনকে হত্যা করা হয় এবং ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেন ১৩ জন। ৬ জানুয়ারি রাজবাড়ীর পাংশায় সরিষা ইউনিয়নের আদিবাসী এক নারী ও তাঁর মেয়ে ধর্ষণের শিকার হন। অন্যদিকে যশোরের কেশবপুরে এক বাক্প্রতিবন্ধী নারী এবং ঢাকায় আদিবাসী গারো তরুণী চলন্ত মাইক্রোবাসে ধর্ষণের শিকার হন। এ ছাড়া কোনো কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে ধর্ষণের সময় ধারণকৃত ভিডিও চিত্র ইন্টারনেটে ছড়ানোর হুমকি দিয়ে চাঁদা দাবি এবং ফেইসবুকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে ভিডিও চিত্র প্রকাশের প্রবণতা দেখা গেছে।

বিগত বছরগুলোর তুলনায় ২০১৫ সালে সালিশ ও ফতোয়ার মাধ্যমে নারী নির্যাতনের সংখ্যা কমেছে। এ বছর ১২ জন নারী সালিশ ও ফতোয়ার মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে থানায় মামলা হয়েছে তিনটি। কিন্তু ২০১৪ সালে সালিশ ও ফতোয়ার মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন ৩২ জন নারী। ১৫ অক্টোবর বরিশালে সালিশের নামে এক গৃহবধুকে জুতাপেটা করা হয়। সিরাজগঞ্জের তাড়াশে ধর্ষণ মামলা আপোস না করায় ধর্ষিতার পরিবারকে সমাজচ্যুত করা হয়। রাজশাহীতে সালিশের মাধ্যমে আদিবাসী নারীকে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয় এবং বগুড়ায় হিল্লা[৪৫] বিয়েতে রাজি না হওয়ায় যুবতীর পরিবারকে একঘরে করা হয়েছে।

বিগত বছরগুলোর তুলনায় ২০১৫ সালে অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনা কিছুটা কমে এসেছে। ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে যেখানে অ্যাসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছেন যথাক্রমে ৬৮, ৪৪ ও ৪৮ জন নারী, সেখানে ২০১৫ সালে মোট ৩৫ জন নারী অ্যাসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে মাত্র ৮টি ঘটনার ক্ষেত্রে মামলা হয়েছে। অপরদিকে ২০১৫ সালে যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ২৯৮জন নারী এবং মামলা হয়েছে ১৫৮টি। এ বছর পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন মোট ৩৭৩জন, যার মধ্যে থানায় মামলা হয়েছে ১৪৬টি। ২০১৫ সালে নারী গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনায় মোট ৬৩জন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন যার মধ্যে ২২টি ঘটনার মামলা হয়েছে।[৪৬]

বাংলাদেশে নির্যাতিত নারী অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার নির্যাতনের বিষয় গোপন রাখে। পারিবারিক শান্তি, সন্তানের ভবিষ্যত, নিজের সম্মান ইত্যাদি নানা কারণে সব নিপীড়ন মুখ বুঁজে সহ্য করে। এদেশে যত নারী নির্যাতিত হয়, তার খুব ছোট অংশই কেবল প্রকাশিত হয়; তাও প্রকাশিত হয় তখন যখন প্রকাশ না করে আর কোনো উপায় থাকে না। দেশে নারীরা এসব নির্যাতনের শিকার হয়ে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে বসবাস করছে, যা একটি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের এই দেশে ইসলামি আইন ও বিধান কার্যকর করে বর্তমান সমাজ কাঠামো অক্ষুন্ন রেখে নারীকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, বন্ধ করা যায় ভয়ঙ্কর নিপীড়ন, নিশ্চিত করা যায় নারীর অধিকার ও মর্যাদা।

৬. বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামি বিধানের ভূমিকা

হযরত রাসূলুল্লাহ **(সা.)**-এর আবির্ভাব প্রাক্কালীন সময়ে আরবে নারী নির্যাতন চরম আকার ধারণ করেছিলো। নারীর জীবন, সম্পদ ও সম্মানের কোনো নিরাপত্তা ছিলো না। প্রকাশ্য আসরে ব্যভিচারিতার নির্লজ্জ প্রদর্শনে নারীকে বাধ্য করা হয়েছিলো। খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, অপহরণ, ব্যভিচারিতার মিথ্যা অভিযোগ, নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি নারী জীবনের প্রতিশব্দ হয়ে উঠেছিলো। ইসলাম নারীকে এমন নির্যাতিত জীবনের পরিবর্তে সম্মানের জীবন দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নারী নির্যাতনের সকল পথ ও পদ্ধতি নিষিদ্ধ করে নারীর মর্যাদাপূর্ণ ও শান্তিময় জীবনযাত্রা নিশ্চিত করেছে।[৪৭]

পরিবারে ও সমাজে নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়। কন্যা হয়ে জন্মানোর অপরাধে তাকে মা-বাবা ও অন্যান্যদের বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হতে হয়। ছেলে সন্তানের চেয়ে সকল ক্ষেত্রে সে কম সুবিধা

ও অধিকার পায়। বিবাহের ক্ষেত্রেও তার কোনো মতামত নেয়া হয় না। বিয়ের পর স্বামী ও তার আত্মীয়দের যৌতুক দাবি এবং সে কারণে নির্যাতন কিংবা এমনিতেই মৌখিক শারীরিক ও মানসিক লাঞ্ছনা নারীকে দুঃসহ জীবনে ঠেলে দেয়। আর্থিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা, মানুষ হিসেবে সমান অধিকার ও মর্যাদা না দেয়া, 'নারীরা পাপের কারণ' বলে অবহেলা ও উপেক্ষা করা, ব্যভিচারে বাধ্য করা, ধর্ষণ, হত্যা, অকারণে তালাক দেয়া, মিথ্যা অপবাদ দেয়া, অসমশ্রমে বাধ্য করা, ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করা, ধর্ম ও শিক্ষা চর্চা থেকে দূরে রাখা, নাচ-গান-বিজ্ঞাপন-নাটক-চলচ্চিত্রে নারীদেহকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার, বিবাহপূর্ব প্রেম এবং শিক্ষা, চাকুরি ও সমাজ জীবনে অবাধ নারী সম্ভোগের ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি পদ্ধতিতে নারী নির্যাতনের শিকার হয়।[৪৮] ইসলামের বিধান অনুসারে নির্যাতনের এ সকল ক্ষেত্র থেকে নারীকে কীভাবে রক্ষা করা যায় আল-কুরআন ও আল-হাদিসে এর বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে।

ইসলামের বিধান অনুসারে, কোনো নারীর প্রতি কোনো পুরুষ ইচ্ছা করে তাকিয়ে থাকতে পারবে না। বরং দৃষ্টি সংযত করবে। নারীও কোনো পুরুষের দিকে তাকিয়ে থাকবে না। অনিচ্ছায় হঠাৎ করে চোখ পড়ে গেলে সাথে সাথে ফিরিয়ে নেবে। কেননা কামনা সৃষ্টি হওয়া বা লোভ জন্ম নেয়ার শুরু চোখের দেখা থেকেই হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে। মুমিন নারীদের বলো তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে।"[৪৯]

সৃষ্টিগতভাবে নারীদেহের প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর জৈবিক আগ্রহ থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় একে নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও পুরুষ বা নারীদেহের উত্তেজক প্রদর্শনী এমনকি সাধারণ প্রকাশও বিপরীত লিঙ্গকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে। ফলে নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের শিকার হয় বেশি। সে কারণে সে অপর পুরুষকে নিজের রূপ সৌন্দর্য দেখা যাবে না। অপর পুরুষের মন বা দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এমন পোশাক পরবে না। অলংকার বা প্রসাধনে নিজেকে আকর্ষণীয় করে পরের সামনে উপস্থাপন করবে না। মহান আল্লাহ বলেন, "মুমিন নারীরা সাধারণভাবে যা প্রকাশ পায় তাছাড়া যেন তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেনো তারা মাথায় কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে। গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে তারা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে।"[৫০]

ঈমানের তাগিদে মুমিন পুরুষ এবং নারী তাদের লজ্জাস্থান হিফাজত করবে। একজন অপরজনকে তার লজ্জাস্থান দেখাবে না এবং যে কোনো হারাম কাজে লজ্জাস্থান ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে। এরফলে নারী নির্যাতনের মতো কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টিই হবে না। উল্লেখ্য, সাধারণভাবে পুরুষের লজ্জাস্থান হলো নাভীমূল থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং নারীর লজ্জাস্থান হলো তার হাত, পা ও মুখমণ্ডল ছাড়া পুরো শরীর।[৫১]

একান্তে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নারী নির্যাতনের একটি অন্যতম কারণ। এ কারণে মুমিন নর-নারী কেউ কারো ঘরে অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করবে না। অনুমতি ব্যতীতে অন্যের ঘরে প্রবেশ করলে লজ্জাস্থানের হিফাযত অসম্ভব হয়ে পড়বে। একান্তে মেলামেশা সহজ হবে। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অপর কারো ঘরে প্রবেশ করো না, যতোক্ষণ না ঘরের লোকদের অনুমতি নাও এবং তাদের সালাম জানাও। যদি তোমরা ঘরে কাউকে না পাও তাহলেও প্রবেশ করবে না। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও, তাহলে ফিরে যাবে।"[৫২] মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে নারী একাকী থাকা অবস্থায় দেখা-সাক্ষাৎ হালাল নয় এমন পুরুষকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। আর পুরুষও অনুমতি না দিলে ঘরে প্রবেশ করবে না। উভয় পক্ষ এভাবে সহযোগিতা করলে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যাবে।

নারীদের সম্পর্কে অশালীন কথার প্রচারণা নারীদেরকে মানসিক নিপীড়নের শিকার বানায়। এ কারণে মুমিন নর-নারী পরস্পরের পবিত্রতার ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করবে। কেউ কারো ব্যাপারে খারাপ

ধারণা পোষণ করে তাকে মানসিক নির্যাতনের শিকার বানাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, "যখন তারা অপবাদ সম্পর্কে শুনলো তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা আপন লোকদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করলো না কেনো?"[৫৩]

মুমিনদেরকে ঈমানী দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে অশ্লীলতা প্রসারের সকল পথ বন্ধ করতে হবে। কেননা মুসলিম সমাজে অশ্লীল অশোভন কোনো বিষয়ের স্থান নেই। সমাজে অশ্লীলতা প্রসার পেলে নারীর মর্যাদা নষ্ট হয়। তার সম্মান বিনষ্টের সম্ভাবনা গড়ে ওঠে। আল্লাহ তাই শুধু অশ্লীল আচরণ নয় বরং অশ্লীল বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলাও হারাম করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।"[৫৪]

সৎ, চরিত্রবান ও পবিত্র নারীর প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ উত্থাপন করলে নারী নিদারুণ মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। এ জাতীয় নির্যাতন থেকে নারীকে রক্ষা করার জন্যে আল্লাহ তাআলা এ ধরনের কাজকে কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "যারা সতি ও পবিত্র চরিত্রবতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে কিন্তু চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিটি কষাঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনোই কবুল করবে না।"[৫৫]

নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য ইসলাম নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে শাস্তিযোগ্য বলে ঘোষণা করেছে। নারী-পুরুষ উভয়ে পারস্পরিক সম্মতিতে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুললে এবং তা চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ হলে মহান আল্লাহ তাদেরকে একশত কষাঘাত করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৫৬] এ শাস্তি অবিবাহিত নারী-পুরুষের জন্য। যদি তারা বিবাহিত হয় তাহলে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে।[৫৭] যদি একজন অবিবাহিত ও একজন অবিবাহিত হয় তাহলে অবিবাহিতকে কশাঘাত এবং বিবাহিতকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। কিন্তু অপরাধটি যদি নারীর অমতে হয়, তাকে যদি এ কাজে বাধ্য করা হয় এবং সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে নারীর অসহায়ত্ব ও অমত সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তাহলে এ জন্যে নারী কোনো শাস্তি পাবে না। বরং এজন্যে ব্যভিচারে বাধ্যকারী পুরুষ শাস্তি পাবে। সে অবিবাহিত হলে তাকে একশত কষাঘাত করা হবে। সে বিবাহিত হলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন, "যে তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করে তাহলে তাদের জবরদস্তির পর আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৫৮]

আজকাল প্রায়ই স্বামীরা স্ত্রীদের বিরুদ্ধে চরিত্রহীনতার অভিযোগ উত্থাপন করে স্ত্রীকে মানসিকভাবে নিপীড়ন করে, অথচ অভিযোগের পক্ষে স্বামীর কোনো প্রমাণ থাকে না। স্বামী যেনো ব্যভিচারিতার এমন মিথ্যা অভিযোগ তুলে স্ত্রীকে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করতে না পারে সে জন্যে আল্লাহ তাআলা লিআনের বিধান দিয়েছেন। এ প্রক্রিয়ায় স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অভিযোগ তুলতে স্বামীকে চারবার আল্লাহর নামের কসম করে বলতে হয়, তার স্ত্রীর ব্যাপারে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপনের ব্যাপারে সে সত্যবাদী। পঞ্চমবারে শপথ করে বলতে হয়, যদি সে এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপর আল্লাহর লানত।[৫৯] অভিযোগ উত্থাপনের পর স্বামী যদি কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে। ইসলামি আকীদায় মহান আল্লাহর নামে কসম করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঈমানের চেতনা জাগরুক থাকা অবস্থায় কোনো মুমিনের পক্ষে মিথ্যার উপর কসম করা অসম্ভব। নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য ইসলাম কসমের এ বিধান প্রণয়ন করেছে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য ইসলাম ব্যভিচার প্রতিরোধের কঠিন দণ্ডবিধান প্রদান করেছে। কারণ অধিকাংশ নিপীড়নের সাথে কোনো না কোনোভাবে ব্যভিচারের সম্পর্ক থাকে। ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন, "তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চারজন পুরুষকে সাক্ষী আনো। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখ, যে পর্যন্ত

না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য অন্য কোনো পথ করে দেন। তোমাদের যে দুজন এই অপকর্ম করে তাকে শাস্তি দাও। এরপর তারা যদি তওবা করে সংশোধিত হয়ে যায়, তাহলে তাদের চিন্তা পরিত্যাগ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তওবা কবুলকারী, দয়ালু।"[৬০]

এ ঘোষণায় মহান আল্লাহ প্রথমত ব্যভিচার প্রমাণের বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তা হলো, এ জন্য চারজন পুরুষের সাক্ষ্য দরকার হবে। দ্বিতীয়ত, ব্যভিচারের শাস্তি নারীর জন্যে ঘরে আবদ্ধ রাখা এবং উভয়কে কষ্ট প্রদান করার কথা উল্লেখিত হয়েছে, এ প্রসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত এই বিধানই সর্বশেষ নয়, বরং ভবিষ্যতে অন্য বিধান আসবে। পরবর্তীতে সে বিধান বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন, "ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশত করে কষাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করায় তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[৬১] অর্থাৎ শাস্তিটি গোপনে দেয়া যাবে না। দিতে হবে প্রকাশ্যে। এ ঘোষণায় মহান আল্লাহ কোনো রকম প্রকরণ ও বিশেষায়ণ ছাড়া ব্যভিচারের শাস্তি একশত কষাঘাত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এ শাস্তি কোন ধরনের পুরুষ ও নারীর জন্যে আল্লাহ তাআলা তার সুনির্ধারিত ব্যাখ্যা দেননি। হযরত মহানবী **(সা.)** এ শাস্তির প্রয়োগগত দিক বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "আল্লাহ তাদের জন্য সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছেন। তা হলো, অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিত নারীর ব্যভিচারের শাস্তি হলো একশ দোররা এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর। আর বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিত নারীর ব্যভিচারের শাস্তি হলো একশ দোররা ও পরে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা।"[৬২]

এ হাদীসে মহানবী **(সা.)** বিবাহিত ও অবিবাহিতকে ভিন্ন ধরনের শাস্তি দিয়েছেন এবং দুটো শাস্তিকেই আল্লাহ তাআলার ফায়সালা বলে উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ হলো, যদিও আল-কুর'আনে প্রস্তারাঘাতে হত্যার বিধান দেয়া হয়নি কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ **(সা.)** এ ফায়সালা ওহির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট থেকেই পেয়েছেন।[৬৩]

ব্যভিচার যেমন জঘন্যতম অপরাধ তেমনি এর শাস্তিও কঠিন। কিন্তু এ শাস্তি সহজেই প্রয়োগ করা যায় না। এজন্যে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী পুরুষের সাক্ষ্য প্রয়োজন। সাক্ষ্য-প্রমাণে ব্যভিচার প্রমাণিত হলে শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো দয়া প্রদর্শন করা যায় না। আবার কষাঘাতের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এতটা কাঠিন্যও অবলম্বন করা যায় না যাতে ব্যক্তি মারাত্মকভাবে আহত হয় বা তার জীবন সংশয় ঘটে।

নারীদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হলে বা নির্যাতন করা হলে তার প্রতিবিধানে ইসলাম কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নারীর শ্লীলতাহানির জন্য নির্যাতন হলে সংশ্লিষ্ট পুরুষ ব্যভিচারের শাস্তিতে দণ্ডিত হবে। কারণ তার লক্ষ্য ছিলো ব্যভিচার। যে কোনো কারণেই হোক সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ব্যর্থ হয়েছে। আর্থিক বা অন্য কোনো বৈষয়িক কারণে নারীকে শারীরিকভাবে আঘাত করে নির্যাতন করা হলে ইসলামি আদালত কিসাসের বিধান[৬৪] অনুসারে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করবে। যতোটুকু নির্যাতন নারীকে করা হয়েছে বা যেভাবে তাকে আহত করা হয়েছে কিংবা আঘাত করা হয়েছে, নির্যাতনকারীকেও ঠিক ততোটুকু পরিমাণ আঘাত করতে হবে। কুর'আন মজীদে এ জাতীয় শাস্তির উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন, "আমি তাদের জন্য তাওরাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে সমান যখম। এরপর কেউ যদি তা ক্ষমা করে তাহলে ক্ষমাকারীর পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই যালিম।"[৬৫]

তাই শারীরিকভাবে নারী যতটুকু নির্যাতিত হবে, ইসলামি আইনের আলোকে ততটুকু নির্যাতন নির্যাতনকারীর উপর চালানো যাবে। অবশ্য নারী নিজে এই কাজ করবে না। ইসলামি আদালত নিজস্ব

ব্যবস্থাপনায় শাস্তি দানের ব্যবস্থা করবে। নারীকে শারীরিকভাবে নির্যাতনের সাথে সাথে যদি তাকে অসম্মান করার জন্য অশালীন কোনো কাজ করা হয় বা কোনো কথা বলা হয়, অপরাধের ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনা করে বিচারক সে জন্যও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে নারীকে এসিড নিক্ষেপ করে নিপীড়ন করা হয়। এসিড নিক্ষেপ ভয়ানক কাপুরুষতা, অমানবিক বর্বরতা। বাংলাদেশে এটি কী ভীতিকর অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে তা ইতোপূর্বে বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয়েছে। এসিড নিক্ষেপের ব্যাপারে কিসাসের শাস্তি কার্যকর করা হবে।[৬৬] অর্থাৎ যে এসিড নিক্ষেপ করবে, তাকেও এসিড দিয়ে ঝলসে দেয়া হবে, ততটুকু, যতটুকু সে করেছে। এর পাশাপাশি এসিড নিক্ষেপের সাথে সাথে সন্ত্রাস সৃষ্টির একটি সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্ত্রাসীর জন্য ইসলাম যে শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে এসিড নিক্ষেপকারীর উপর সে শাস্তিও কার্যকর করা যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হলো, তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ার জীবনে এটাই তাদের লাঞ্ছনা আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।"[৬৭] ইসলামের শাস্তিবিধান অনুসারে এ সকল শাস্তি প্রকাশ্যে জনসমাবেশে কার্যকর করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো মমতা বা দয়া দেখানো যাবে না। তাহলে মূলত অপরাধী আরও অপরাধ করার উৎসাহ পাবে। শাস্তি যদি জনসমাবেশে প্রকাশ্যে কার্যকর করা হয় তাহলে নতুন করে কেউ আর একই অপরাধ করতে সাহসী হবে না।[৬৮] শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে এই নীতি ও পদ্ধতি উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহর বিধান কার্যকর করায় তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[৬৯] এমন পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হলে এসিড নিক্ষেপ থেকে নারীকে রক্ষা করা যাবে।

বাংলাদেশে পথে-প্রান্তরে নারী নানা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির শিকার হন। বখাটে এবং ভদ্রবেশী বিভিন্ন বয়সের পুরুষরা তাদেরকে নানাভাবে উত্যক্ত করে। অশ্লীল কথা বলে, অঙ্গভঙ্গি করে, শীষ বাজিয়ে, স্বাভাবিক পথচলা ব্যাহত করে, নানা কুপ্রস্তাব দিয়ে প্রভৃতি রকমারি পদ্ধতিতে নারীকে উত্যক্ত করা হয়। বলা বা লেখায় নারীর প্রতি উত্যক্তকরণের ক্ষতিকর প্রভাব বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। বরং সংশ্লিষ্ট নারীই এই বিড়ম্বনার অন্তহীন কষ্টের কথা বলতে পারেন। যে কারণে আমরা বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে উত্যক্তকরণের শিকার নারীকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে দেখি।[৭০] এসব ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হলো, উত্যক্তকরণের কারণে নারী যদি আত্মহননের পথ বেছে নেয় তাহলে সংশ্লিষ্ট উত্যক্তকারী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে। কারণ প্রত্যক্ষভাবে হত্যায় অংশ না নিলেও সেই মূলত হত্যাকারী। তাকে ইসলাম নির্ধারিত হত্যার শাস্তিই দেয়া হবে। আর যদি উত্যক্তকৃত নারী আত্মহননের পথ বেছে না নেয় তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় এবং অশালীন কার্যকলাপ সৃষ্টির দায়ে উত্যক্তকারীদের বিরুদ্ধে বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দণ্ডবিধান কার্যকর করা হবে।[৭১]

বাংলাদেশে যৌতুক এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকা। অথচ ইসলামে যৌতুকের কোনো স্থান নেই। ইসলামে বরং বিবাহের জন্য স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে মোহরনা আদায় করতে হয়। যৌতুক তাই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং ইসলামবিরুদ্ধ প্রথা। মুসলিমদের এ প্রথায় অভ্যস্ত হওয়ার অর্থ হলো ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া। ইসলামি আদালাত ইসলামি বিধানের বিরুদ্ধাচারণের জন্য যারা যৌতুক দাবি করবে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থা অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[৭২]

নারী হওয়ার কারণে নারীর প্রতি কোনো অসম আচরণ করা যাবে না।[৭৩] যেমন নারী শিশুকে কম খেতে দেয়া, পুরুষ শিশুকে বেশি খেতে দেয়া, নারী শিশুকে কম আদর করা বা অবহেলা করা আর পুরুষ শিশুকে বেশি আদর করা, নারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা আর পুরুষকে সকল উত্তরাধিকারের

মালিক করে দেয়া। শরিআতে নিষেধ না থাকলে নারী বলে কাউকে কাজে নিয়োগ না দেয়া, নারী হওয়ার কারণে তাকে লেখাপড়া থেকে দূরে রাখা ইত্যাদি বিষয়গুলো ইসলাম সমর্থন করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলাম বরং নারী শিশু ও নারীকেই পুরুষের উপর অধিক মর্যাদা এবং অধিকতর অধিকার প্রদান করে থাকে।[৭৪]

৭. উপসংহার

প্রকৃতপক্ষে মানুষের বিবেককে জাগ্রত না করে, ধর্মীয় আবেগকে উপেক্ষা করে যে আইনই বাংলাদেশে করা হোক না কেনো, সে আইনের বাস্তবায়ন আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভবই প্রতীয়মান হয়। বাংলাদেশে প্রচলিত নারী নির্যাতন বিরোধী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনসমূহের ব্যর্থতা এ বার্তাই প্রদান করে। এ প্রেক্ষাপটে আলোচ্য প্রবন্ধে উপস্থাপিত বিধি ও ব্যবস্থাপনার আলোকে বলা যায়, বাংলাদেশের ধর্মভীরু মানুষের চেতনায় যদি নারী নির্যাতনবিরোধী বোধ ইসলামের শিক্ষা ও বিধানের আলোকে যথাযথভাবে জাগ্রত করা যায়, নির্যাতনের কারণে দুনিয়া ও আখিরাতের ভয়ানক পরিণাম যদি প্রামাণ্য আকারে তাদের নিকট উপস্থাপন করা যায় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্যাতনরোধক ইসলামি আইনসমূহ যদি নির্মোহ ও নিরপেক্ষ থেকে ন্যায়ানুগভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. W.J.Creswell, *Educational Research Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research.* New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall, 2008

২. Government of The People's Republic of Bangladesh, *Statistical Yearbook of Bangladesh 2015,* Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics & Information Division (SID), Ministry of Planning, 35th Edition, May 2016, p.51

৩. ড. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, মাঘ ১৪১৩), পৃ. ৬৭৮ ও ৬৯৫

৪. প্যাসিফিক এশিয়ান উইমেনস ফোরামের নারী নির্যাতন বিষয়ক আলোচনায় প্রদত্ত নিপীড়ন বা ভায়োলেন্সের সংজ্ঞা। ড. মোঃ নুরুল ইসলাম উদ্ধৃত, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা* (ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৬), পৃ.৩৩১

৫. *Bengali-English Dictionar* (Dhaka: Bangla Academy, 1998), p.357

৬. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ–সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল–হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪), পৃ.৫২৩

৭. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩০

৮. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল* (ঢাকা: রোহেল পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭), পৃ.২৩৬; ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩০; জাতীসংঘ প্রণীত সকল বিধি–উপবিধিতে শব্দটির সাধারণ ব্যবহার থেকেও এ সম্পর্কে জানা যায়।

৯. সি. বানচ, 'দুর্বিষহ স্থিতাবস্থা : নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা', *বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার* (ঢাকা: ইউনিসেফ, ১৯৯৭), পৃ.৬০

১০. জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন-বেইজিং, ঢাকা: ১৯৯৫, ড. মোঃ নুরুল ইসলাম উদ্ধৃত, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩২

১১. Quoted by Syed Mehdi Momin, 'Violence against women and children : searching for causes', *Weekend Independent* (Dhaka: 12 February 1999), p.4

১২. "Violence against women is not just an assault against an individual but against women's personhood, mental or physical integrity or over freedom of movement on account of their gender."- Jyoti Talukder, 'Violence Against Women in Nepal', *Country Report CWCD,* Nepal, 1997, p.1

১৩. নূর কামরুল নাহার, 'নারী নির্যাতন : মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি', দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা, ১৬ এপ্রিল, ২০০১, পৃ.১০

১৪. Syed Mehdi Momin, 'Violence against women and children : searching for causes', ibid, p.12
১৫. Abdul Halim, *The Enforcement of Human Right* (Dhaka: 1995), p.3
১৬. S. Halima, *Violence against women in Bangladesh,* Dhaka: 2000, p.12
১৭. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *সামাজিক সমস্যা ও সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪৪
১৮. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩৩
১৯. তদেব, পৃ.৩৪৩
২০. বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ও জরিনা রহমান খান, 'বাংলাদেশে নারী নির্যাতন', *সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃ.৩
২১. Syed Mehdi Momin, 'Violence against women and children : searching for causes', ibid, p.4
২২. Government of Bangladesh, Planning Commission, *1998 Fifth Five Year Plan 1997-2002,* Ministry of Planning, p.IX, 1-5
২৩. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১১ আগস্ট, ২০০৯, পৃ.৪
২৪. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ৬ অক্টোবর, ২০০৯, পৃ.২৪
২৫. তদেব, পৃ.২৩
২৬. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ২ ডিসেম্বর, ২০০৯, পৃ.৭
২৭. জনসংখ্যা বিষয়ক জরিপ প্রতিবেদন, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (নিপোর্ট) মিলনায়তন, ৯ জুলাই ২০০৯ (সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১০ জুলাই, ২০০৯, পৃ.৩)
২৮. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১৪ আগস্ট, ২০০৯, পৃ.২৪–২৩
২৯. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ৬ ডিসেম্বর, ২০০৯, পৃ.৫
৩০. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১৩ আগস্ট, ২০০৯, পৃ.১০
৩১. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১০, পৃ.১২
৩২. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১০, পৃ.২৪ ও ২১
৩৩. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১৮ জুন, ২০০৯, পৃ.১০
৩৪. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১৩ আগস্ট, ২০০৯, পৃ.৫
৩৫. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ৩১ জুলাই, ২০০৯, পৃ.১২
৩৬. 'অগ্নিদগ্ধ ফাতেমা ॥ আর কত পৈশাচিকতা?', দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ.১২
৩৭. 'প্রথম আলো–বিএনডব্লিউএলএর গোলটেবিল বৈঠক ॥ যৌন হয়রানী রোধে মানা হচ্ছে না হাইকোর্টের রায়', দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১৯ নভেম্বর, ২০০৯, পৃ.২০
৩৮. 'নারীকে উত্যক্ত করা ॥ সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া রেহাই মিলবে না', দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ২৩ অক্টোবর, ২০০৯, পৃ.১২
৩৯. 'দোররা মারা কবে বন্ধ হবে', দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ২২ জুন, ২০০৯, পৃ.১৩
৪০. সৌমিত্র মানব, 'আন্তর্জাতিক নারী দিবসেই নির্যাতনে গৃহবধূ সোমার মৃত্যু', সাপ্তাহিক ২০০০, ঢাকা, ১২ মার্চ, ২০১০, বর্ষ ১২ সংখ্যা ৪৪, পৃ.৪৪
৪১. 'খিলগাঁও বিভীষিকা ॥ সব ধর্ষককে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করুন', দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ২২ মার্চ, ২০১০, পৃ.১২
৪২. Women for Women, A Research and Study Group 1997, *Regional Overview on Violence Against Women: A Working Paper for Expert Group Meeting,* Dhaka, p.3
৪৩. United Nations Leaf-let Published on the Year of the Family 1993, p.3
৪৪. মো. নূর খান ও শাহীন আখতার সম্পাদিত *মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০১৫*, ঢাকা: আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ.৮
৪৫. স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিলে তালাক দেয়া স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করতে পারে না। এটি ইসলামের সাধারণ হুকুম। তালাকের পরিমাণ হ্রাস করা এবং তালাক দেয়ার আগে ব্যাপক চিন্তা–ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইসলাম এমন হুকুম প্রদান করেছে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "ইসলামে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল হলো তালাক।" এ হুকুমের একটি ব্যতিক্রমও রয়েছে। উক্ত তালাকপ্রাপ্তা নারী যদি অন্য কোনো পুরুষকে বিয়ে করে এবং সেখানে সে তালাকপ্রাপ্তা হয় বা বৈধব্যবরণ করে তাহলে প্রথম স্বামীর সাথে তার পুনরায় বিয়ে হতে পারে। লক্ষণীয়, ব্যতিক্রমটি দুটি 'যদি'র উপর নির্ভরশীল। 'যদি' পরের স্বামী তালাক দেয় বা মৃত্যুবরণ করে এবং 'যদি' তারা পুনরায় পরস্পর বিয়েতে সম্মত হয় তাহলেই কেবল বিয়েটি বৈধ হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রথাটির ভয়ানক লংঘন প্রত্যক্ষ করা যায়। এদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে একদল লোক থাকে যারা অর্থের বিনিময়ে মধ্যবর্তী বিয়েটি করে এবং বিয়ের পরপরই তালাক দেয়। কোনো কোনো অঞ্চলে নিতান্তই ভোগের উদগ্র লালসা থেকে ক্ষমতাসীনরা এ ধরনের বিয়ে করে থাকে। ঘটনা এমনও ঘটে, ইসলামি আইনে হয়তো তালাকই হয়নি, তারপরও সমাজপতিরা একে তালাক হিসেবে গণ্য করে সংশ্লিষ্ট নারীকে মধ্যবর্তী বিয়েতে বাধ্য করে। বাংলাদেশে এ পদ্ধতিটি হিল্লা বিয়ে নামে কুখ্যাত।

স্মর্তব্য যে, এ জাতীয় কোনো বিয়ের অনুমতি বা বৈধতা ইসলামি আইনে একেবারেই নেই। তালাক দেয়ার নিয়্যতে যে বিয়ে, ইসলাম তাকে বিয়ে বলেই স্বীকৃতি দেয় না।

৪৬. মো. নূর খান ও শাহীন আখতার সম্পাদিত *মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০১৫*, ঢাকা: আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ.৯–১০

৪৭. অধ্যাপক নাজির আহমেদ ও ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস* (ঢাকা: আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫), পৃ.২৬৭

৪৮. আল্লামা আবদুস সামাদ রাহমানী, *নারী মুক্তি কোন পথে?* ভাষান্তর: মুফতী মুঈনদ্দীন তৈয়বপুরী, ঢাকা: ২০০০, পৃ.৭৭

৪৯. আল–কুরআন, ২৪: ৩০-৩১

৫০. আল–কুরআন, ২৪: ৩৯

৫১. আবদুল হামিদ আহমদ আবু সুলাইমান, *বৈবাহিক সমস্যা ও কুরআন মজীদের সমাধান* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০১০), পৃ.৭৭

৫২. আল–কুরআন, ২৪: ২৭ - ২৮

৫৩. আল–কুরআন, ২৪: ১২

৫৪. আল–কুরআন, ২৪: ১৯

৫৫. আল–কুরআন, ২৪: ৪

৫৬. আল–কুরআন, ২৪: ২

৫৭. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল–কুশায়রী আন–নিশাপুরী (র.), *মুসলিম শরীফ* (পঞ্চম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩), কিতাবুল হুদূদ, হাদীস নং ৪২৬৭, পৃ.১৩৪

৫৮. আল–কুরআন, ২৪: ৩৩

৫৯. আল–কুরআন, ২৪: ৬–৯

৬০. আল–কুরআন, ৪: ১৫-১৬

৬১. আল–কুরআন, ২৪: ২

৬২. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল–কুশায়রী আন–নিশাপুরী (র.), *মুসলিম শরীফ* (পঞ্চম খণ্ড), পূর্বোক্ত, কিতাবুল হুদূদ, হাদীস নং ৪২৭১, পৃ.১৩৬

৬৩. আবদুল হালীম আবু শুককাহ, *রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ১ম খণ্ড* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০১১), পৃ.৪৩

৬৪. প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য হত্যা দাবি করা। সজ্ঞানে অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করার যে বিধান রয়েছে, ইসলামি পরিভাষায় তাকে কিসাস বলে। –আল কুরআনুল করীম, ৪২তম মুদ্রণ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০), টীকা ১২১, পৃ.৪৩

৬৫. আল–কুরআন, ৫: ৪৫

৬৬. গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গে* (ঢাকা: ১৯৮১), পৃ.৬০

৬৭. আল–কুরআন, ৫: ৩৩

৬৮. এ জেড এম শামসুল আলম, *ইসলামি প্রবন্ধমালা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪), পৃ.২৮৭

৬৯. আল–কুরআন, ২৪: ২

৭০. ইসহাক ওবায়দী, *যুগে যুগে নারী*, (ঢাকা: ১৯৯৭), পৃ.৫৪

৭১. ড. জামাল আল বাদাবী, ***ইসলামি*** *শিক্ষা সিরিজ* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০০৮), পৃ.৮৭

৭২. বি আইশা লেমু ও ফাতেমা হীরেন, *ইসলামের দৃষ্টিতে নারী* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০১০), পৃ.২১

৭৩. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ.৮৮

৭৪. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *নারী* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮), পৃ.৪৭